২৫-০৬-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি সচেতন-বুদ্ধিমান বাচ্চারা- সদা স্মরণে রাখো যে আমরা হচ্ছি অবিনাশী আত্মা, আমাদেরকে এখন বাবার সাথেই - প্রথমে সেই কক্ষেতেই (ঘরেতেই) যেতে হবে"

প্রশ্নঃ- এমন কোন পরিশ্রম তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চাদেরকেই, অবশ্যই করতে হবে ?

উত্তরঃ- বাবা, তোমাদের যিনি এত জ্ঞান দেন, তাঁকে তোমরা নিজের হৃদয়ের মণি-কোঠায় ধারণ করতে থাকো। নিজের মনের ভিতরে ভিতরে ওনাকে মনন করে যদি তা হজম করো, তাতে শক্তি পাবে। এই পরিশ্রম অবশ্যই প্রত্যেককেই করতে হবে। এবং যে এরকম গুপ্ত পরিশ্রম করে, সে সদাই খুশীতে থাকে, তার নেশা থাকে যে, কে আমাদের পড়াচ্ছেন! আর আমরা কার সামনেই বসে আছি!

ওঁম শান্তি। এই ওঁম শান্তি ধ্বনি কে করলেন ? দুইবার ধ্বনিত হলো ওম শান্তি, ওম শান্তি। একবার বললেন শিববাবা আর একবার বললেন ব্রহ্মা বাবা।এই দুয়ে একত্রিত হয়ে হন বাপদাদা। তাই তো দুজনকেই বলতে হয় ওম শান্তি, ওম শান্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এখন প্রথমে কে তা বলেন ? আর পরেই বা কে বলেন ? প্রথমে শিববাবাই বলেন ওম শান্তি। অর্থাৎ আমিই শান্তির সাগর। আর তার পরে কে বলেন ? যিনি দাদার আত্মা। তিনিই বাচ্চাদের স্মরণ করায় ওম শান্তি। উনি (শিববাবা) বলেন - "আমি তো সদাই দেহী -অভিমানী হয়েই থাকি, কখনও কিন্তু দেহ-অভিমানে আসি না। এই একমাত্র বাবাই আছেন, যিনি সদাই দেহী-অভীমানী স্থিতিতে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - এরা কিন্তু তা বলতে পারবেন না। তোমরা তো জেনেছো যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্মরূপ থাকে। তাই তো এই ওম শান্তি এক শিববাবাই করে থাকেন, যার আবার কোনও শরীরই নেই। বাবা তোমাদেরকে খুব ভালভাবেই তা বোঝান আর এও বলেন যে, আমি তো (কল্পে) মাত্র একই বার আসি, এবং আমি সদাই দেহী-অভিমানী ভাবে থাকি। আমি কখনই পুনর্জন্মের নিয়মে আসি না। তাইতো এই কারণে আমার গুন ও মহিমা সম্পূর্ণই আলাদা ধরণের। আর তাই তো আমাকেই বলা হয় নিরাকার-পরমপিতা-পরমআত্মা। ভক্তি-মার্গেতেও শিবকে বলা হয় নিরাকার-পরমপিতা-পরমাত্মা। সেই নিরাকারের পূজা হয়ে থাকে। উনি কখনও দেহ সহিত আসেন না অর্থাৎ দেহ-অভিমানী হন না। আচ্ছা, এবার তার থেকে নীচের স্তরে আসা যাক্ - অর্থাৎ সূক্ষ্মবতনে, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর-রা থাকেন। শিবের কোনও প্রকার নাম রূপ তো আর দেখা যায় না। যদিও তার চিত্র তৈরি হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থপ উনি হলেন নিরাকার। যিনি কখনও সাকার রূপে আসেনই না। তাই পূজাও সেই নিরাকারেরই হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সব জ্ঞান ভরা থাকে। তোমরা ভক্তি তো অনেকই করেছো। কত প্রকার চিত্রও তোমরা বাচ্চারা দেখেছো, তোমরা এও জানো যে, সত্যযুগ-ত্রেতাতে চিত্রের কোনও ভক্তি হয় না - আর না হয় বিচিত্রের (নিরাকারের)। তা কেবল বুদ্ধিতেই থাকে, পরমপিতা পরমাত্মা বিচিত্র অর্থাৎ নিরাকার। যার না থাকে কোনও সূক্ষ্ম চিত্র আর না থাকে কোনও স্থূল চিত্র। কেবল ওনার গুন-মহিমার কীর্ত্তন করা হয় - দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা, পতিত-পাবন এই সব বলে। কিন্তু, তোমরা আর কারও কোনও চিত্রকেই পতিত-পাবন বলতে পারো না। কিন্তু, এমন কোন মনুষ্য নেই যে, যার বুদ্ধিতে এই কথাটা সহজেই ঢোকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - এনারা হলেন সূক্ষ্ম-বতনবাসী। প্রথম তল, তারপরে দ্বিতীয় তল। এই ভাবেই উঁচু থেকে অতি-উঁচু তল হলো মূলবতন।

আর ঐ তলেই থাকেন পরমপিতা- পরমআত্মা। দ্বিতীয় (স্তরে) নম্বরের তলে থাকেন সূক্ষ্ম শরীরধারীরা। আর তৃতীয় (স্তরে) তলেতে আছেন স্থূল শরীরধারীরা। যদিও এতে নিরাশ হবার ব্যাপার নেই। এই সব (রহস্যের) কথা পরমপিতা-পরমআত্মা ছাড়া আর কেউই তা বোঝাতে পারে না। আত্মাদের সৃষ্টি হয় উপরের তলে (স্তরে)। যাকে বলা হয়ে থাকে নিরাকারী দুনিয়া, অর্থাৎ আমাদের সব আত্মাদের দুনিয়া বা ঘর। যা অশরীরী/আধ্যাত্মিক দুনিয়া। তারপর আমরা আত্মারা শরীরী (ভৌতিক) দুনিয়াতে আসি। ওখানে থাকে আত্মারা, আর এখানে থাকে জীব-আত্মারা। এটা অনশ্যই বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আমরা কিন্তু সেই নিরাকারী বাবারই বাচ্চা। আমরা প্রথমে সেই নিরাকার বাবার কাছেই থাকতাম। যেহেতু নিরাকারী দুনিয়াতেই আত্মারা সব থাকে। যারা এখনও পর্যন্ত্য আসছে, সাকার রূপ ধারন করে তাদের কর্ম-কর্তব্য ও ভুমিকা পালন করবার জন্য এই সাকার দুনিয়াতে। ওটা হলো নিরাকার বাপের বতন (ঘর)। প্রকৃততে আমরা কিন্তু আত্মা- আমাদের এই নেশা থাকা আবশ্যক। অবিনাশী বস্তুর প্রতি নেশা থাকা খুবই প্রয়োজন। যা বিনাশী বস্তুর প্রতি হওয়া উচিত নয়। দেহের প্রতি নেশা থাকলে, তাকে দেহ-অভিমানী বলা হয়। আচ্ছা! দেহ-অভিমানী ভালো, নাকি আত্ম-অভিমানী ভালো ? কে বেশী সচেতন ? অবশ্যই আত্ম-অভিমানী। যেহেতু আত্মা অবিনাশী আর দেহ তো বিনাশী। আত্মারা নিজেরাই তা বলে যে, আমরা ৮৪-বার দেহ ধারণ করি। আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সাথে বাস করে থাকি। ওখান থেকে এখানে আসি নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্য ও ভুমিকা পালন করার জন্য। আত্মারাই বলে থাকে -"ও বাবা"। সাকারী সৃষ্টিতে যেমন আছে সাকারী বাবা। তেমনি নিরাকারী সৃষ্টিতেও আছে নিরাকার বাবা। এটা তো খুবই সহজ-সরল কথা। এখানে ব্রহ্মা কে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা। সেটাও তো এখানের দুনিয়ারই সম্বন্ধই হলো। ওখানে (মূলবতনে) আমরা সব আত্মারা সবাই একই বাবার বাচ্চা, অর্থাৎ ভাই-ভাই সম্বন্ধ। যারা সবাই শিববাবার সাথে একসঙ্গেই থাকি। পরমাত্মার প্রকৃত নাম শিব। আর আত্মাদের নাম শালিগ্রাম। এই আত্মাদেরও তো রচয়িতা চাই। তাই হৃদয়ের স্মরনে সর্বদাই তার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে রাখো। যে জ্ঞান তোমরা পেয়েছো, তা নিজের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থাপন করার জন্য পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। আত্মাই দ্বারই সবাই বিচার করে। শুরুর প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করবে যে, প্রকৃত অর্থে, আমরা আত্মারা আমাদের বাবার সাথেই পরমধামে অবস্থান করে থাকি। যেহেতু আমরা ওনার সন্তান তাই অবশ্যই ওনার আশীর্ব্বাদের বর্ষা নেওয়াটা খুবই দরকার। আর এটাও তোমরা জানো যে, এই যে আত্মাদের ঝাড় সৃষ্টি হয়, তার আগে নিশ্চয় তা বীজ রূপে থাকে। তারপর তাকে ক্রমানুসারে বড় থেকে ছোটর সারি বানানো হয়। বড়- বাবা (শিব) তারপর তা থেকে ২-৪ জনকে আলাদা করেন। তারপরে আবারও তার থেকেও আরও বের করেন। এই ভাবেই একটা- দুটো করতে করতে আর ঝাড়ও বৃদ্ধি পেতে পেতে- একসময় সেই ঝাড় অনেক বড় আকারের হয়ে যায়। যা পরে বংশের নকশায় পরিনত হয়। তখনই লোকেরা বলে- ইনি এই বংশের, উনি ঐ বংশের, ইত্যাদি। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, মূলবতনেই সকল আত্মারা থাকে। তাঁরও একটা চিত্র আছে। উঁচু থেকে অতি-উঁচু হলেন বাবা। তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা তো আছেই -বাবা (শিব) এই (ব্রহ্মার) শরীরে অনস্থান করছেন। রুহানী বাবা (পরমাত্মা) এনার (ব্রহ্মার) মধ্যেই অবস্থান করে রুহুকে (আত্মাদেরকে) পাঠ পড়ান। সূক্ষ্মবতনে তো আর উনি এ সব পাঠ পড়াবেন না। কারণ, সত্যযুগে আর এই জ্ঞান কারুরই থাকে না। তাই তো বাবা নিজেই এই সঙ্গম যুগেতে এসে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী ঝাড়ের জ্ঞান আর কারুরই নেই। তাই তো কল্পের আয়ুকেও পুঁথি-পত্রে অনেক বেশী-লম্বা হিসেবে লিখে রেখেছে। এখন বাবা তোমাদেরকে তা বোঝাচ্ছেন- "বাচ্চারা এখন তোমাদের ঘরে ফিরতে

হবে। ওটাই হলো আত্মাদের প্রকৃত ঘর। বাবা আর বাচ্চারাই সেখানে থাকে, সেখানে সবাই ভাই-ভাই ভাবে থাকে। কিন্তু ভাই আর বোন তখন বলা হয়, আত্মারা যখন এখানে এসে শরীর ধারণ করে। অতএব, আমরা আত্মারা সব ভাই- ভাই। আবার এই ভাইদেরও নিশ্চয় বাবা তো থাকবেই। যিনি হলেন, সেই পরমপিতা পরমাত্মা। অর্থাৎ সকল আত্মারাই তাদের নিজের নিজের শরীরে অবস্থান করে থাকলেও, ঐ এক ওনাকেই (শিববাবাকেই) স্মরণ করে। সত্যযুগ-ত্রেতাতে কিন্তু কেউ তাকে স্মরণ করে না। পতিত দুনিয়াতে এলে, তখনই সকলে ওনাকে স্মরণ করে। কারন সবাই রাবনের কারাগারে বন্দী থাকে। তাই তো আত্মারূপী 'সীতা' ডাকতেন- "হে রাম।" বাবা তাই বোঝান- রাম কিন্তু কোনো ত্রেতা যুগের রামের স্মরণের ব্যাপার নয়। রাম অর্থে- পরমপিতা পরমাত্মাকে ভেবেই তাকে স্মরণ করে। আর আত্মারাই তাঁকে ডেকে থাকে। এখন তো তুমি অবশ্যই জেনেছো, সেই আধাকল্প আমরা কাউকে ডাকব না, যেহেতু তখন তো আমরা সেই সুখধামেই অবস্থান করি। এই সঙ্গম সময়েই বাবা এসে আমাদেরকে তা বোঝান, যা আর অন্য কেউই তা জানেনই না। অন্যেরা তো বলে - আত্মাই পরমাত্মা। আর সেই আত্মাই আবার পরম-আত্মাতে লীন (বিলীন) হয়ে যায়। বাবা তার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝান, আত্মা তো অবিনাশী সত্বা। কোনও একটা আত্মারও বিনাশ হতে পারে না। যেরকম বাবা অবিনাশী- সেরূপ আত্মারাও সব অবিনাশী। এখনে এসেই সেই আত্মারা পতিত ও তমোপ্রধানে পরিনত হয়, তারপর এই বাবা-ই আবার তাদেরকে সতোপ্রধান পবিত্র বানিয়ে থাকেন। সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনে, বর্তমানের সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এই সময়কালে তমোপ্রধানে কলুষিত হয়। যা নিয়মের ফেরে, তা আবার বাবার দ্বারাই সতোপ্রধান হয়। আর তাই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানানোর জন্য বাবাকে তো এই দুনিয়ায় আসতেই হয়। তাই তো ওনাকেই বলা হয়ে থাকে (গড় ফাদার) ভগবানেরও পিতা। বাবা যেমন অবিনাশী, আমরা আত্মারাও তেমনি অবিনাশী। আবার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকও অবিনাশী। তোমরা বাচ্চারাই তা জানো যে, এই দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোলের- কিভাবে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই চার যুগ ধরেই আমাদের কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা চলতে থাকে। (কল্পের শুরু সত্যযুগে) প্রথমে আমরা হই সূর্যবংশী তারপরে হই চন্দ্রবংশী। চন্দ্রবংশী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তে আসে। তখন তাদের কলা ও গুনের হ্রাস ঘটে, তাই ১৪ কলাকে সূর্যবংশী বলতে পারি না। বাস্তবে, তখন আর তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা যায় না। দেবী-দেবতারা তো হন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। তাই রামকেও ১৪ কলা সম্পন্ন বলা হয়ে থাকে। একমাত্র তোমাদেরকেই এইভাবে ৮৪ জন্মের হিসাব বোঝানো হয়। নতুন কোনো জিনিষ যেমন পুরনো হলে, সেই মজা ও স্বাদ তাতে আর থাকে না। প্রথমে তা সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে, তারপর কিছু বছর অতিবাহিত হলে তাকে অল্প পুরনোই তো বলবে। যেমন ঘর-বাড়িরও উদাহরণ দেওয়া যায়। এরকমই সকল জিনিষের ক্ষেত্রেই হয়। এই দুনিয়াটাও সেই প্রকারের বড় এক খেলাঘর। কিন্তু এই আকাশ তত্ব তো অনেক বিশাল। যার কোনও আদি-অন্তই নেই। এর শেষ যে কোথায়, তা কিন্তু জানাই যায় না। যদি কেবল চলতেই থাকো, তবুও তার শেষ খুঁজে পাবে না। ব্রহ্ম-মহত্বেরও কোনো শেষ নেই। এমনিতে তো বিজ্ঞানীরা কতই না চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার শেষ দেখার, কিন্তু তা আর দেখতে পায় না, অন্ত খুঁজেই পায় না। ব্রহ্মতত্ব যে বিশাল বড় - যা অসীম। আমরা আত্মারা, অনেক অল্প জায়গা জুড়েই থাকি সেখানে। এখানে তো লোকেরা কত বিশাল, বড় বড় অট্টলিকা ইত্যাদি বানায়। কিন্তু ঐ দুনিয়া তো অনেক অনেক বড়, তবুও সেখানে খালি থাকে। এখানে তো চাষ-বাস, খেত ইত্যাদির জন্যও তো জায়গা চাই। আর ওখানে তো খালি আত্মারাই থাকে। আচ্ছা, আত্মারা শরীর ছাড়া কি করে তবে খাবে ? বাস্তবে ওখানে তো সবাই অভোক্তা-রূপে থাকে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া বা কোনও প্রকারের ভোগ ইত্যাদি করবার জন্য কোনও বস্তুরই প্রয়োজন হয়

না। তাই তো বাবা এত করে বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, এই জ্ঞান তোমাদের মাত্র একই বার মেলে। আবার পরবর্তী কল্পে, বাচ্চারা তোমাদেরকে তা দেওয়া হয়। তাই তো এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও নেশা থাকা দরকার। একদা তোমরাই তো দেবতা ধর্মের ছিলে। তোমরাই তা বলো যে, বাবা আজ থেকে ৫ হাজার বর্ষ আগে আমরাই আপনার কাছে এসেছিলাম শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবার জন্য। যা এখন আবার আমরা আপনারই কাছে এসেছি। উনি (শিববাবা) নিরাকার হওয়ার কারনে তোমরা তাই তা বলবে দাদার (ব্রহ্মার) কাছে এসেছি। যেহেতু বাবা এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেছেন। বাবা বলেন- যেরকম তোমরা শরীর গ্রহণ করে তা দিয়ে কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা পালন করো, সেরকম আমিও (শিববাবা) ব্রহ্মার শরীরের আধার নিই। তা না হলে, আমি আমার ভুমিকা পালন করবো কি করে ? এইভাবেই তো শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব তো আসলে নিরাকার। তবুও ওনার জয়ন্তী পালন করা হয় কি করে ? মনুষ্যরা তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। বাবা বলেন- সে রকম না হলে আমি কি করে এসে তোমাদেরকে তবে রাজযোগ শেখাবো ? মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য এই রাজযোগ কেবল এই বাবা-ই এসে শেখান। তাই তো লোকেরা আমাকে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলে। আর কেবলমাত্র আমার মধ্যেই এই সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের আদি, মধ্য ও অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, বাবা এনার শরীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে সেই সব জ্ঞানকে বোঝান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের ভুমিকাকেও অবশ্যই বুঝতে হবে। বাবাকে তো তোমরা বুঝেছো যে উনিই পতিত-পাবন। প্রত্যেকেরই গুন ও মহিমা আলাদা-আলাদা, কর্ম-কর্তব্যও আলাদা-আলাদা হয়। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদিদেরও হয়। আত্মাই তা বলে যে, -এটা আমার শরীর। যেমন প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেন -"আমি প্রধানমন্ত্রী।" কিন্তু, সে ক্ষেত্রে আত্মা যদি শরীরের সাথে না থাকে, তবে কিন্তু তা বলতেই পারে না। আর শিববাবা তো হলেন নিরাকার। ওনাকেও তেমনি কিছু বলার জন্য কর্ম-ইন্দ্রিয়র আধার তো নিতেই হয়। এরই নমুনা স্বরূপ বোঝাবার জন্য দেখানো হয় যে, গোমুখ থেকে গঙ্গা বেরোচ্ছে। প্রকৃত অর্থে শিব তো হলেন ক্ষুদ্র একটি বিন্দি বা বিন্দু-স্বরূপ। তাই ওনার আবার মুখ কোথা থেকেই বা গঙ্গা এলো ? তাই তো উনি (শিব) এনার (ব্রহ্মার) মুখে এসে বসেন, যেখান থেকে জ্ঞানের-গঙ্গা বইতে থাকে। আর তাই তো সবাই বাবাকেই স্মরণ করে, আর বলে-হে পতিত-পাবন তুমি আসো। এসে আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে উদ্ধার কর। যেহেতু একমাত্র উনিই বড় থেকেও অতি বড় সার্জেন। একমাত্র ওনারই কাছে- পতিতদের পাবন বানাবার সেই জ্ঞান আছে। এই দুনিয়ার সব পতিতদেরকেই পাবন বানানোর এই একজনই মাত্র সার্জেন আছেন। সত্যযুগে কিন্তু সবাই নিরোগী-ই হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই সেই সত্যযুগের মালিক। কিন্তু এনাকে সে রকম কর্ম-কর্তব্য কে শিখিয়েছেন যাতে ওনারা এরকম নিরোগী হতে পারে। বাবা এসেই তো সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম শিখিয়েছেন। এখানে তো কর্মই কুটতে (সুফল ভোগ করতে) থাকেন ওনারা। তাই সত্যযুগে এরকম কেউ বলবেই না যে ওনাদের কর্ম ভোগ করতে হচ্ছে। যেহেতু ওখানে কোন দুঃখ, রোগ-ভোগ ইত্যাদি হয়ই না। অথচ এখনে তো একে অন্যকে কেবল দুঃখই দিতে থাকে। কিন্তু সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তো দুঃখের কোনও কথাই নেই যে বলা হবে, এটা তার কর্মের ভোগ ভুগছে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের প্রকৃত অর্থ সেভাবে কেউ বুঝতেই পারে না। তোমরা তো জেনেছো, প্রত্যেক বস্তুই প্রথমে সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো ও তমোতে পরিণত হয়। সত্যযুগের ৫ তত্ত্বই তখন সতোপ্রধান থাকে। তাই আমাদের শরীরও তখন সতোপ্রধান আর প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান। তারপর আবার যখন আত্মার দুই কলা কম হয়, যার জন্য শরীরও সেরকম তৈরি হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই তখন দুই কলা কম হয়ে যায়। এইসবই বাবা এখানে বসে বোঝাতে থাকেন, যা আর অন্য কেউই তা বোঝাতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবা তার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এখন থেকেই বাবার শ্রীমতের নির্দ্দেশের ধারনায় এরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে, যাতে কখনো কর্ম কুটতে (ভোগ ভুগতে) না হয় অর্থাৎ কর্মের সাজা খেতে বা ভুগতে না হয়।
২) কোন বিনাশী বস্তুর প্রতি আকাঙ্খা বা নেশা যেন না থাকে। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই দেহও বিনাশী, তাই এর প্রতিও মোহ বা নেশা রাখা উচিত নয়। এ রকমই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হতে হবে।

বরদানঃ- স্থূল আর সূক্ষ্ম এই দুই রীতিতেই নিজেকে ব্যস্ত রেখে মায়াজিত হয়ে বিজয়ী হও (ভব)।

নিজেকে সেবাধারী ভেবে নিজের রুচি আর উৎসাহের সহিত সেবায় ব্যস্ত থাকলে মায়ার কোনও সুযোগ পাবে না। যদি সঙ্কল্পের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, স্থূল কর্মনা থেকে মুক্ত থাকো, তবেই মায়া সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু স্থূল আর সূক্ষ্ম দুই রীতিতেই খুশী-খুশীতেই সেবাতে ব্যস্ত থাকো, তখন সেই খুশীর কারণে মায়া তাকে আক্রমন করার সাহসই করতে পারে না। এইজন্যই নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে, প্রত্যেক দিনের কর্মসূচী বানাও, যার ফল স্বরূপ মায়াজিত হয়ে- বিজয়ী হতে পারবে।

স্লোগানঃ- নিশ্চয় আর গর্বের সাথে বলো- বাবা যখন আমার সাথেই আছেন, তাই তো আর মায়া নিকটেই আসতে পারবে না।